রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ও আমাদের ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট

দেবল দেব

ইদবোশেখি | ২৪ মার্চ ২০২৬ | ৩১৭ বার পঠিত | রেটিং ৪ (১ জন)

ছবি: ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক

একটা বিরলশ্রুত রবীন্দ্রগান এদিন শুনলাম, আবার। শুনতে শুনতে আবার, আবার মনে হচ্ছিল, রবি ঠাকুর একবার উচ্চারণ করেছিলেন, পরজন্মে যেন বাংলায় আর না জন্মাতে হয়! শিউরে উঠি। মনে পড়ে বিদ্যাসাগর মশাইও স্বভূমির প্রতি গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করতেন। আবার এই গান শুনি।

দেশবাসীর ভণ্ডামি ও চাটুকারিতার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার এক হতাশাপ্লুত মুহূর্তের সৃষ্টি এই গান। রবীন্দ্রনাথ দেশমাতৃকাকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেন, "কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে?"

পরম আক্ষেপে তিনি দেশমাতাকে জানিয়ে দেন, "এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভাণে।"

এই বেদনাদিগ্ধ কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে কবি বর্ণনা করেন মাতৃভূমির আশ্চর্য উত্তরাধিকার, ভারতের ঐতিহ্যের সম্পদরাশি। কোনো দেশের নিসর্গ বা ভূখণ্ড, শস্যক্ষেত্র, নদী- অর্থাৎ, একটি সভ্যতার কেবল ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহই নয়, যুগ যুগ ধরে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাকে সমৃদ্ধ করেছে সেটিও। মাতৃভূমি তার সন্তানদের অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর সব সমস্ত সম্পদ দান করে যান- স্বর্ণশস্য, জাহ্নবী বারি, সহস্রাব্দপ্রাচীন প্রজ্ঞা, জীবনের সুস্থ নির্বাহপ্রণালী, প্রাচীন লোককথার রত্নসম্ভার। অবাক হয়ে দেখি, একটি সভ্যতার ঐতিহ্যের কত কিছু কবি ইঙ্গিত করেছেন, কত পরিমিত শব্দ ব্যবহার ক'রে।

সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী যে-কোনো মহান সভ্যতা সম্পর্কেই এই বিবরণ সুপ্রযুক্ত। কিন্তু, ভারতের মতো আশ্চর্য এক দেশের বর্ণনায়, এই শব্দাবলী যেন পরতে পরতে খুলে দেয় বিপুল এক বিশ্ববীক্ষায় সম্পৃক্ত সুপ্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের এক অপূর্ব জগত। আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতার দিকে যাত্রাপথে যা আজ বিস্মৃত, পরিত্যক্ত। এই গানটির অনুষঙ্গে, কয়েক হাজার বছর আগের প্রাচীন লোককথার ও জ্ঞানভাণ্ডারের উত্তরাধিকার স্মরণ করি। সকলের সঙ্গে এখানে ভাগ করে নিতে চাইছি সেই ঐতিহ্যের অজস্র রত্নরাজির ভিতর থেকে, আমার প্রিয় দুটি রত্ন - প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের দুটি রত্ন।

প্রথমটি হলো, প্রাচীন ভারতীয় ধর্মে, এখন যাকে আমরা হিন্দু আচার বলি, তারই আদিতম রূপটি - শেষকৃত্য পালনের সময় উচ্চারিত মন্ত্রটি। অন্যূন তিন হাজার বছরের প্রাচীন এই মন্ত্রটির পৌরাণিক পটভূমিকাটি এইরকম: রাজপুত্র রামচন্দ্র পুণ্যস্নান সেরে, একমুঠি তিল বীজ ও নদীর পবিত্র জল নিয়ে, পূর্বপুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করছেন। তাঁর মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে প্রয়াত সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয়, মানব-অমানব, পার্থিব ও অপার্থিব সকল সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের ঐকান্তিক ইচ্ছা। তাঁর পর তর্পণ করবেন তাঁর ভাই লক্ষ্মণ। কিন্তু, বড় বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায়, দীর্ঘ স্তবকমালাকে এক সংক্ষিপ্ত মন্ত্রের রূপ দিলেন তিনি।

লক্ষ্মণ উচ্চারণ করলেন, "যাঁরা আমার পরিচিত, আর যাঁরা আমার অপরিচিত, পূর্বের জন্মেও যাঁরা আমার পরিচিত ছিলেন *(যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ)*, আমার হাতের এই তর্পণবারি যেন তাঁদের সকলের তৃপ্তি বিধান করে।"

অবশেষে, সেই অপূর্ব উচ্চারণ: "ব্রহ্ম থেকে তৃণ অবধি *(আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং)* জগতের সকলে তৃপ্ত হউন"।

এই অনন্য স্তোত্রটি, অতুলনীয় মানব চেতনার দিকটি আমাদের সামনে প্রকাশ করে। জীবনের সম্ভাব্য ব্যাপ্তিকে প্রত্যক্ষ করার এই দর্শন, সর্বময় স্রষ্টা, ব্রহ্মসত্তা থেকে একটি ঘাসের প্রাণ পর্যন্ত, মহাবিশ্বজগতের প্রতিটি প্রাণকে। মনুষ্য-কেন্দ্রিকতাকে ছাপিয়ে, এমনকি পৃথিবী ছাড়িয়ে, সেই ভাবনা আরও সুদূরে বিস্তৃত। স্তোত্র রচয়িতার পরিচয়টি আজও অজ্ঞাত।

এই অপূর্ব বিশ্ববীক্ষা, Weltanschauung, এ-দেশের মাটিতেই অর্জিত হয়েছিল, উত্তরাধিকারসূত্রে যা আমরা পেয়ে ধন্য হয়েছি।

প্রাচীন লোকগাথার আমার প্রিয় দ্বিতীয় রত্নটি, বাস্তবিক একটি অদ্বিতীয় অতুলনীয় মহাজাগতিক চেতনা। সাড়ে চার হাজার বছর আগের এই সেই প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূত্রটি। রিলিজন অর্থে যে কোন ধর্মের উদ্ভবের বহু আগে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ তম স্তোত্রে উদ্ধৃত, যা স্তোত্রটির প্রথম ছত্রানুসারে নামাঙ্কিত। *নাসদাসীন্নসদাসীৎ* - না ছিল অনস্তিত্ব, না অস্তিত্ব। আধুনিক কালে যাকে আমরা বলি 'আদি মহাবিস্ফোরণ', সেই বিগ ব্যাং-এর পলমাত্র আগে, কেমন ছিল মহাবিশ্বের রূপটি, সেই জন্মলগ্নটি বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টায়, এই 'সূত্র' - একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বর্ণনাটি, আমাদের আক্ষরিক অনুবাদে, এরকম:

"ছিল না অনস্তিত্ব, ছিল না অস্তিত্ব; কোন ধূলিকণা [কোন বস্তুকণা] ছিল না, না ছিল ব্যাপ্ত আকাশ।

কীসে আবৃত ছিল এই মহাবিশ্ব? কোথায়? অতল তারল্যের গহন গভীরে *(কিমাসীদাহনং গভীরম্)*?

মরণ ছিল না, অমরত্বও ছিল না। দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না।

ছিল আঁধার। গূঢ় তমসায় আবৃত ছিল সে।"

"সেই মহাপরিব্যাপ্ত অনস্তিত্বের মহাকম্পন থেকে স্বতপস্যায় জন্ম নিয়েছিল সেই এক [অদ্বিতীয়] অস্তিত্ব"
(তুচ্ছ্যনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মাহিনাজায়লতৈকম্)।

সেই দ্রষ্টা, কবি, স্বপ্নদ্রষ্টা এরপর বলেন, "সেই ঘন তমিস্রা থেকে আবির্ভাব হয়েছিল এক আকাঙ্ক্ষার। যার অভ্যন্তরে নিহিত ছিল অস্তিত্বের আদি বীজ। প্রাজ্ঞ ঋষিরা যাকে অস্তিত্বহীনতার শূন্যতা থেকে পৃথক করে চিনে নিতে জানেন।"

এই সূত্রের শেষ স্তবকে সর্বমানবীয় চিরন্তন কৌতূহলটি প্রকাশ করে -

"কে নিশ্চিত জানে, কে ঠিক বলতে পারে *(কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ)* ঠিক কী ছিল, কেমন করে সেই অদ্বিতীয় অস্তিত্ব আবির্ভূত হয়েছিল?"

যাঁদের আমরা দেবতা বলে জানি, তাঁদের জন্মও তো এই অস্তিত্ব সৃষ্টির পরে। তাহলে, কে জানে, কোথা থেকে সেই অস্তিত্বের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল?

এখানে অনেকে বিভিন্ন ভূখণ্ডের, বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিকল্পনার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য পেতে পারেন। বিজ্ঞানের দার্শনিকরা বলেন, এসব সৃষ্টিপুরাণের কল্পনা, যত উচ্চাঙ্গের হোক, তা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে, কারণ বিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় মহাবিশ্বের উৎপত্তির পরের বস্তু ও ঘটনাবলী। নিঃসন্দেহে, "স্থল ছিল না, জলও ছিল না"; "দিন ছিল না, রাত্রিও ছিল না"; "এক তারল্য ছিল স্পন্দমান", ইত্যাকার কাছাকাছি বর্ণনা অন্য কয়েকটি প্রাচীন সৃষ্টিপুরাণে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্বের কোন সৃষ্টিকাহিনী ও কল্পনায় যা আদৌ পাওয়া যায় না, সেটা পাঠ করি একমাত্র এই নাসদীয় সূত্রের শেষ পঙক্তিতে।

"যিনি এ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ স্তরে *(পরমে ব্যোমান)* অবস্থান ক'রে যে "অধ্যক্ষ'' সমস্ত কিছু অধীক্ষণ করেন, সেই তিনি জানতে পারেন। অথবা তিনিও জানেন না" - *সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ!*

এই শেষ পঙক্তিটির প্রথমার্ধকে ঈশ্বরববাদী দর্শনের শুরু বলা যেতে পারে; একজন সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ "অধ্যক্ষ'' আছেন, এরকম কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু শেষার্ধটি এই পরমব্যোমস্থিত স্থান-কালের কোন এক অত্যুচ্চ ডাইমেনশনে অধিষ্ঠিত, সর্বজ্ঞ দ্রষ্টার কল্পনাটিকেও চূর্ণ করে দেয়, নাকচ করে দেয়। আমরা স্তম্ভিত হয়ে শুনি, চিরকালের অজানা, চির-অজ্ঞেয়, অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের পরপারের প্রচণ্ড কল্পনার ধ্বনি। যা বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত পৌরাণিক বর্ণনার, এবং সমস্ত ধর্মতত্ত্বের মহাবিশ্ববিষয়ক ধারণার চেয়ে কেবল আলাদা নয়, একেবারে বিপ্রতীপ, সেই পরম "এক"-এর চিররহস্যের বাণীর উদগাতা।

হ্যাঁ, এই দেশের সংস্কৃতি এইরকম বিস্ময়কর সুগভীর বিশ্ববীক্ষার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে - যে উত্তরাধিকার অজ্ঞানকূপে ফেলে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ-কথিত চেতনাহীন দেশবাসীজন "সনাতনী" ধর্মাচারের "কত কী ভাণে" নিমজ্জিত।

"দুঃখ জানায়ে কী হবে জননী, নির্মম চেতনাহীন পাষাণে!"

কৃতজ্ঞতা: এই লেখাটি আমার একটি মূল ইংরেজি রচনার ভাষান্তর। প্রাথমিক খসড়া অনুবাদটি করে দিয়েছিলেন গোলাপ দাশগুপ্ত।

পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক।

গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি। যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : guruchandali@gmail.com ।